এই বিষয়টি আলোচনা করার জন্য তারা দুটি ধারণা ব্যবহার করেন : বর্জন (exclusion) এবং ভোগ (consumption)। বর্জন বলতে বোঝানো হয় যে একটি পণ্যের ওপর ক্রেতা ও বিক্রেতা কী পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে সেই বিষয়টি। অধিকাংশ পণ্যের ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট মূল্যকে (price) কেন্দ্র করে ক্রেতা বা বিক্রেতা সেই পণ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। কিছু কিছু পণ্য অন্য পণ্যের অধিক প্রয়োজনীয়তার কারণে বাজারে থাকে না বা তাদেরকে রাখা হয় না। এগুলোর ক্ষেত্রে ক্রেতা বা বিক্রেতার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং বাজারে ঢোকার সম্ভাবনা এগুলোর খুব কম। উদাহরণ হিসেবে সমুদ্রের আলোঘরের কথা বলা যেতে পারে যার পরিষেবা সমুদ্রের সব জাহাজই নিতে পারে। এটিকে বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় ধারণাটি হল ভোগ। কিছু কিছু পণ্য বা পরিষেবা ব্যক্তিগত স্তরে ভোগ করা হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভোগ করার ফলে তার মান বা পরিমাণ কমে যায়। কিন্তু কিছু কিছু পরিষেবা যেমন টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত অনুষ্ঠান অনেকে ভোগ করে এবং ভোগ করার ফলে গুণগত বা পরিমাণগত দিক থেকে সেটি কমে যায় না।

বর্জন বা বাজারে স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা এবং ভোগ—এই দুটির ওপর নির্ভর করে পণ্য এবং পরিষেবাকে সাভাস্ চার ভাগে ভাগ করেছেন : ব্যক্তিগত পণ্য ও পরিষেবা, উপশুল্ক পণ্য, সর্বসাধারণের পণ্য ও যৌথ পণ্য। ব্যক্তিগত পণ্য ও পরিষেবা ব্যক্তির ভোগের জন্য এবং এই জাতীয় পণ্যের বাজারে স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। ওইসব পণ্য ও পরিষেবার জোগান দাবীর ওপর নির্ভর করে এবং সাধারণত জোগানের কোনো সমস্যা থাকে না। ব্যক্তিগত পণ্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ কোনো ভূমিকা থাকে না; পণ্যের সুরক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রেই সরকারের ভূমিকা সীমিত থাকে।

উপশুল্ক দ্রব্যগুলো যৌথভাবে ভোগ করা হয় এবং এগুলোরও বাজারে স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। এগুলোরও বাজারে জোগান যথেষ্ট বেশী; তবে ব্যক্তিগত পণ্যের সঙ্গে পার্থক্য হল এই যে এগুলো যৌথভাবে ভোগ করা হয়। এগুলোকে সাধারণ একচেটিয়া বা natural monopoly বলা হয় কারণ এগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী সংখ্যা বাড়লে ব্যক্তি প্রতি দাম কমে। পানীয় জল সরবরাহ বা বিদ্যুৎ এই ধরনের পণ্যের উদাহরণ। এগুলোর ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণের একটা ভূমিকা থাকে।

সর্বসাধারণের পণ্য ব্যক্তিগত স্তরে ভোগ করা হয় এবং এগুলো বাজারে জোগানের সমস্যা আছে কারণ এগুলো ভোগ করার ক্ষেত্রে কোনো মূল্য দিতে হয় না। যেহেতু সর্বসাধারণের দ্রব্য সকলের ব্যবহারের জন্য সেই কারণে এই দ্রব্য উপভোগ করার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না। গারেট হার্ডিনের মতে, এই কারণেই সর্বসাধারণের পণ্যের অপব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে। দূষণমুক্ত বায়ু সর্বসাধারণের পণ্যের একটি উদাহরণ।

যৌথ দ্রব্য বা পণ্য সকলের উপভোগের, এবং এগুলোরও বাজারে জোগান সম্ভব নয়। এগুলোর ক্ষেত্রেও ব্যক্তিকে এর উপভোগ থেকে বঞ্চিত করা যায় না; তবে সর্বসাধারণের পণ্যের সঙ্গে যৌথদ্রব্যের তফাত হল যে যৌথদ্রব্য যৌথভাবে ভোগ করা হয় এবং সর্বসাধারণের পণ্য ব্যক্তিগত স্তরে ভোগ করা হয়। যৌথদ্রব্যের উদাহরণ হিসেবে জাতীয় সুরক্ষার কথা বলা যায়, যৌথদ্রব্যের ক্ষেত্রেই সরকারের ভূমিকা ও নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে বেশী।

সাভাসের মতে সরকার ক্রমাগত তার নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে এবং ব্যয়বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত পণ্যগুলোকে সর্বসাধারণের পণ্যে রূপান্তরিত করছে এবং উপশুল্ক দ্রব্যগুলোকে সর্বসাধারণের দ্রব্যে নিয়ে আসছে। এইভাবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন ইত্যাদি ব্যক্তিগত ও উপশুল্ক দ্রব্যগুলোকে যৌথদ্রব্যে রূপান্তরিত করছে এবং এগুলোর ক্ষেত্রে তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখছে। জনপছন্দ তাত্ত্বিকেরা সরকারের ভূমিকা কমিয়ে, কীভাবে বিকল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই দ্রব্য ও পরিষেবার জোগানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, সে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

তথ্যসূত্র :

১. Ranney, Austin, (ed.) *Political Science and Public Policy,* Chicago, Markham, 1968.

২. Henry, Nicholas, *Public Administration and Public Affairs,* New Delhi, Prentice Hall, 2003.

৩. Wright-Mills, C. *The Power Elite,* New York, Oxford University Press, 1956.

৪. Kohlmeir, L. M. *The Regulators : Watchdog Agencies and the Public Interest,* New York, Harper and Row, 1969.

জনপছন্দের তাত্ত্বিকেরা সামগ্রিকভাবে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদী মডেলকেই গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন অটো একস্টাইন (Otto Eckstein), রবার্ট বিশ (Robert Bish) পণ্য এবং পরিষেবার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন, আবার কেউ কেউ যেমন গর্ডন টুলক্ (Gordon Tullock), অ্যান্থনি ডাউনস্ (Anthony Downs) সিদ্ধান্ত-গ্রহণের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সিদ্ধান্ত-গ্রহণে ব্যক্তিগত উদ্যোগের সম্পর্কটি আলোচনা করেন।[১৬]

জনপছন্দ ও রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতি (Public Choice and Political Economy) : জনপছন্দের তাত্ত্বিকদের একাংশ রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতির ধারণা প্রয়োগ করে নীতি-নির্ধারণের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা অর্থনীতির থেকে 'প্যারেটোকে সর্বাধিক অনুকূল অবস্থা' বা Pareto Optimality-র ধারণাটি গ্রহণ করেন। অর্থনীতিবিদ প্যারেটো (Vilfredo Pareto) এই ধারণাটি তৈরী করেন। 'প্যারোটো সর্বাধিক অনুকূল অবস্থা'র ধারণাটির এখানে ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ধরা যাক একটি কাল্পনিক সামাজিক মূল্য (Social value) হচ্ছে 'ক'। মনে করা হোক, অন্যান্য সামাজিক মূল্যের চেয়ে 'ক'-কেই অধিকাংশ জনগণ পছন্দ করে। এখানে যেসব মূল্য সম্পর্কে সমাজ উদাসীন, অর্থাৎ যেসব মূল্য সমাজের কাছে পছন্দের নয় বা কাঙ্ক্ষিত নয় সেগুলোকে 'উদাসীনতার রেখা চিত্র' দিয়ে বোঝানো হচ্ছে (indifference curve)। অপরদিকে মূল্যপ্রাপ্তির রেখাচিত্রের সাহায্যে সেইসব মূল্যগুলোকে বোঝানো হচ্ছে যেগুলো শুধু জনগণ চায় তাইই নয়, যেগুলো সরকারের পক্ষে প্রদান করাও সম্ভব। এই রেখাচিত্রদুটি যে বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে, সেটিই হচ্ছে 'প্যারেটো-সর্বাধিক অনুকূল অবস্থা' বা (Pareto Optimality)। জনপছন্দের তাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে Pareto optimality-র লক্ষ্যে পৌঁছোনো বাস্তবে খুব দুরূহ; সেই কারণেই তারা Pareto Improvement বা প্যারেটো-উন্নতিবিধানের কথা বলেন অর্থাৎ সমাজ Pareto Optimality-র লক্ষ্যে পৌঁছোবার চেষ্টা করবে কিন্তু Pareto Improvement-এ বাস্তবে পৌঁছোবে। সহজভাবে বলা যায় যে Pareto Improvement হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যেখানে অর্থনৈতিক সংগঠনের পরিবর্তনের ফলে প্রত্যেকেই তার আগের অবস্থান থেকে উন্নতি করবে বা এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে অন্তত কিছু ব্যক্তির অবস্থার উন্নতি ঘটবে এবং কোনো ব্যক্তির অবস্থার অবনতি ঘটবে না।

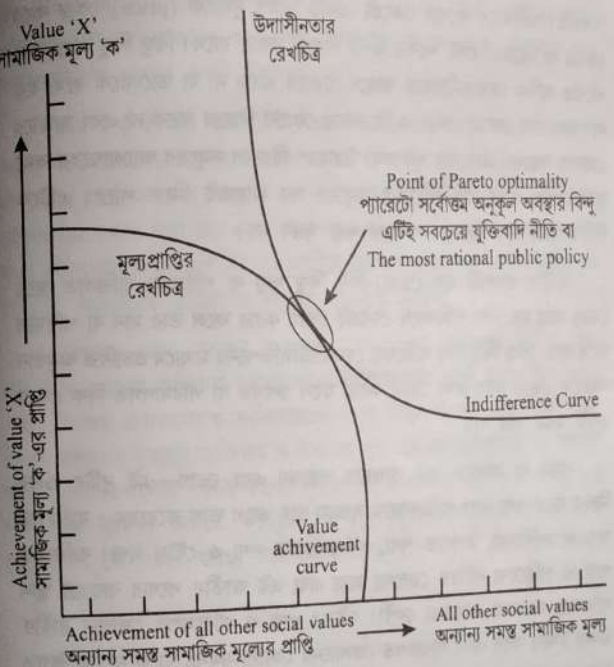

প্যারেটো সর্বোত্তম অনুকূল অবস্থা ও জনপছন্দ

জনপছন্দ ও সরকারী-বেসরকারী পণ্য ও পরিষেবা (Public Choice and Public and Private) : ভিনসেন্ট ও ইলিনর অস্ট্রম (Vincent and Elinor Ostrom), ই. এস. সাভাস (E. S. Savas) প্রমুখেরা জনপছন্দ তত্ত্বের অন্য একটি ধারাকে অনুসরণ করে যুক্তিবাদী মডেলকে কিছুটা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন।[১৭] এঁরা যে বিষয়টি নিয়ে মূলত আলোচনা করেন তা হল যে কোন্ কোন্ পণ্য ও পরিষেবা সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বন্টিত হবে এবং কোন্ কোন্গুলো বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বন্টিত হবে।

বলেন যে নতুন এবং জরুরি অবস্থার সময়ে এই মডেল সম্পূর্ণভাবে অপ্রাসঙ্গিক। যেসব সমস্যার ক্ষেত্রে পুরোনো কোনো অভিজ্ঞতা বা নীতি নেই সেখানে পুরোনো নীতির মধ্যে থেকে নতুন নীতি বেরিয়ে আসতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এই মডেলটির লক্ষ্য হল স্থিতাবস্থা-রক্ষা করা। এইসব সমালোচনা সত্ত্বেও বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইভাবেই নীতি নির্ধারিত হয়ে থাকে।

কৌশলগত পরিকল্পনার মডেল (Strategic Planning Model) : নীতি-গ্রহণের তৃতীয় মডেলটি হল 'কৌশলগত-পরিকল্পনার মডেল'। এই মডেলটি যুক্তিবাদী মডেল ও ক্রমবর্ধিত নীতির মডেলের ইতিবাচক দিকগুলোকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এবং এদের দুর্বলতাগুলোকে পরিহার করে। এই মডেলটি মার্কিন অর্থনীতিবিদ আমিতাই এৎজিওনি (Amitai Etzioni) জনপ্রিয় করেন এবং মূলত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নীতিগ্রহণের ক্ষেত্রে এটি প্রাসঙ্গিক।

আধুনিক যুগে বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠন একদিকে যেমন কাজের দিক থেকে ক্রমাগত বড় হচ্ছে, একইসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সঙ্গে মানিয়েও নিতে হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বলতে আর্থিক সম্পদ, আর্থিক অভাব, পরিবেশগত সমস্যা ইত্যাদিকে বোঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ সংগঠনের কিছু স্থানীয়, স্বল্পমেয়াদি দাবী থাকে এবং একইসঙ্গে কিছু দীর্ঘমেয়াদি, ভবিষ্যৎ-সম্পর্কিত দাবীও থাকে।

কৌশলগত পরিকল্পনার মডেল এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি দেয়। ১৯৬২ সালে মার্কিন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষিতে অ্যালফ্রেড শ্যান্ডলার (Alfred Chandler Jr) এই ধরনের নীতি-নির্ধারণের কথা বলেন।[১৫] তবে সেই সময়ের পর থেকে সরকারী সংগঠনের ক্ষেত্রেও এই ধরনের নীতি-গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

কৌশলগত পরিকল্পনা একটি সংগঠনের মুখ্য প্রশাসকের ব্যক্তিগত চিন্তা নয়; আবার বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানের পরিকল্পনার সমন্বয়ও নয়। সংগঠনের উচ্চ-পদস্থ আধিকারিকদের দ্বারা তৈরী হয় কৌশলগত পরিকল্পনা। সংগঠনের মুখ্য প্রশাসক, একেবারে উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং মধ্যবর্তী আধিকারিকরা কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরী করে থাকে।

কৌশলগত পরিকল্পনার মডেলে সিদ্ধান্ত গুরুত্ব পেয়ে থাকে। অর্থনীতি, যুক্তিবাদী পর্যালোচনা, রাজনৈতিক মূল্যবোধ এবং অংশগ্রহণকারীদের মনস্তত্ত্ব—এই

সবকিছুর সমন্বয় ঘটে কৌশলগত পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে। এই মডেলে নাগরিকদের অংশগ্রহণের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। এইভাবে যুক্তিবাদী নীতি-নির্ধারণের মডেল এবং বর্ধিত নীতি-নির্ধারণের মডেলের সমন্বয় ঘটে কৌশলগত-পরিকল্পনা মডেলের মধ্যে দিয়ে।

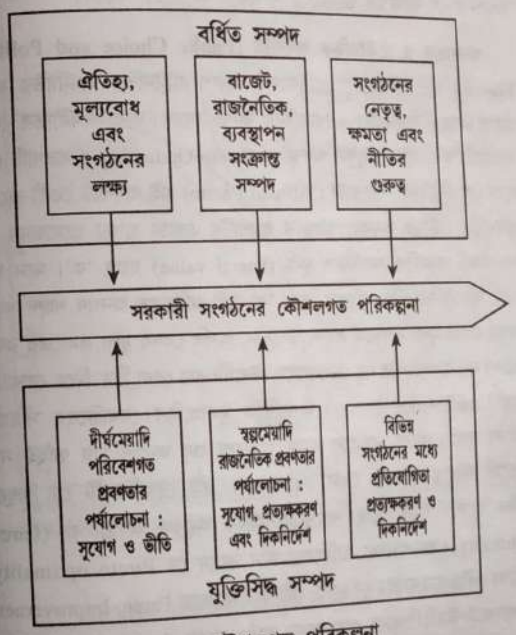

কৌশলগত পরিকল্পনা

যুক্তিবাদী নীতি-নির্ধারণ মডেলের সংশোধন :

জনপছন্দ তত্ত্বের মডেল (Public Choice Model) : যুক্তিবাদী নীতি-নির্ধারণ মডেলের কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে একটি ভিন্ন ধরনের মডেল দেয় জনপছন্দের তাত্ত্বিকেরা। ১৯৬০-এর দশক থেকে জনপছন্দ জনপ্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হিসেবে গড়ে উঠেছে।

যুক্তিবাদী মডেলকে বাস্তবে প্রয়োগ করা অত্যন্ত কঠিন। সামাজিক পছন্দ বা তাদের প্রত্যেকের মূল্যমান সম্পর্কে কোনো ঐকমত্য নেই। এইভাবে নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক ও বিস্তারিত তথ্যের প্রয়োজন তা অনেক সময়েই সহজে পাওয়া যায় না। অথবা পাওয়া গেলেও তার জন্য অনেক বেশী মূল্য দিতে হয়। এই বাধাগুলোর কথা মাথায় রেখে বলা যায় যে, এই মডেলটি নিঃসন্দেহে কাঙ্ক্ষিত কিন্তু কতটা প্রয়োজনযোগ্য তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে মার্টিন রেইন (Martin Rein) বলেন :

> We need a combined standard for judging the desirability of policies able to pass the tests of what is politically feasible, ideologically acceptable, and rationally compelling, and such a common standard can never be developed.[১৩]

ক্রমবর্ধিত নীতি (Incremental Policy) : এই মডেলটি যুক্তিবাদী মডেলের বাস্তব সমস্যাটিকে স্বীকার করে এবং প্রশাসনের কতগুলো প্রকৃত সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চার্লস লিন্ডব্লমের (Charles E. Lindblom) বিভিন্ন লেখায় এই মডেলটির সার্থক উপস্থাপন পাওয়া যায়।

লিন্ডব্লমের মতে নীতি-নির্ধারকেরা সবসময়েই গৃহীত কর্মসূচী ও বাজেটের মধ্যে কাজ শুরু করে। এরপর তারা সেইখানে নতুন কর্মসূচী বা নীতি ঢোকায়। সরকারী প্রশাসনে মূলত incrementalism চলতে থাকে অর্থাৎ পুরোনো কাজগুলো কিছুটা পরিবর্তনসহ চলতে থাকে। এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে, সরকারী প্রশাসনে সিদ্ধান্তের শৃঙ্খল থাকে এবং এই সিদ্ধান্তগুলোকে ভবিষ্যতের নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রশাসক ব্যবহার করেন।[১৪]

Incrementalism বা ক্রমবর্ধিত নীতিগ্রহণকে লিন্ডব্লম বিযুক্ত বর্ধিত নীতি বা disjointed incrementalism বলেছেন। Incrementalism বলতে বোঝানো হয় যে নীতি-নির্ধারকদের কাছে সীমিত-সংখ্যক বিকল্প নীতি থাকে; অপরদিকে 'বিযুক্ত' কথাটির এক্ষেত্রে অর্থ হল যে বিকল্প অবস্থা বা সম্ভাবনার মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা সমগ্র সমাজেই হয়। Disjointed Incrementalism শব্দটি ব্যবহার করার আগে লিন্ডব্লম Muddling through শব্দটি ব্যবহার করেন। Muddling throughর অর্থ হল বিভিন্ন উপাদান বা বস্তুকে অগোছাল, এলোমেলো করা। লিন্ডব্লমের মতে এইভাবে এলোমেলো বিভিন্ন বিকল্প সম্ভাবনার মধ্যে দিয়ে নীতি-নির্ধারণের দিকে এগোয় প্রশাসক।

পরবর্তীকালে তিনি incrementalism শব্দটি ব্যবহার করেন এবং নীতি-গ্রহণের incremental model তৈরী করেন। প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত-গ্রহণকে এক্ষেত্রে রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। ধরে নেওয়া হয় যে, নীতি-নির্ধারকদের পক্ষে নতুন নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। কারণ তাদের কাছে উপযুক্ত সময়, সম্পদ এবং প্রয়োগক্ষমতা নেই। সেই কারণে পুরোনো নীতিগুলোকেই একটু রদ-বদল ঘটিয়ে নতুন নীতি নেওয়া হয়। যেহেতু সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়িত করা অত্যন্ত কঠিন, ফলে যুক্তিবাদী নীতি-নির্ধারণের চেয়ে ক্রমবর্ধিত নীতিগ্রহণ পদ্ধতি অনেক বেশী কাঙ্খিত এবং প্রাসঙ্গিক বলে অনেকে মনে করেন।

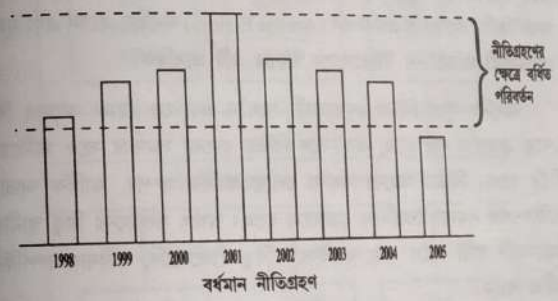

বর্ধমান নীতিগ্রহণ

সরকারী প্রশাসনে নীতি-গ্রহণের বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে গিয়ে লিন্ডব্লম আরও দুটি ধারণার প্রয়োগ করেন : প্রান্তিক বর্ধন (Marginal incrementalism) এবং পক্ষপাতিত্বমূলক পারস্পরিক সমঝোতা (partisan mutual adjustment)। প্রথমটির ক্ষেত্রে পুরোনো নীতির থেকে সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন নীতি গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের মত এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে থেকে যে সিদ্ধান্তটিতে ঐকমত্যে পৌঁছোনো হয়, সেটিকে গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে 'সমঝোতার' ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিভিন্ন বিপরীতধর্মী স্বার্থ ও দাবীর মধ্যে থেকে একটি সমঝোতায় পৌঁছোনোই এক্ষেত্রে নীতি। সেই কারণে নীতি বাস্তবে disjointed incrementalism-এর রূপ নেয়।

এই আলোচনা থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে ক্রমবর্ধিত নীতির মডেল এবং যুক্তিবাদী-নীতির মডেল সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। ড্রর এই মডেলের সমালোচনা করে

যুক্তিবাদী নীতিগ্রহণ

(৩) প্রত্যেকটি বিকল্প নীতির সম্ভাব্য পরিণামকে চিহ্নিত করা এবং তার মূল্যায়ন করা অর্থাৎ প্রত্যেকটি নীতির ক্ষেত্রেই কী পাওয়া যাবে এবং কী ত্যাগ করতে হবে তার পার্থক্য বা তার অনুপাত নির্ধারণ করা;

(৪) এই বিকল্পগুলোর মধ্যে থেকে যেটা বেশী মূল্যবান বা cost-effective বলে মনে হবে সেটিকে গ্রহণ করা।

যুক্তিবাদী নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়া সাইমনের মতে তিন ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত। তথ্যমূলক কাজ, পরিকল্পনামূলক কাজ এবং পছন্দসূচক কাজ। নীতি-নির্ধারণের প্রথম পর্যায়টি অর্থাৎ নীতিগ্রহণের উপযুক্ত পরিবেশ খোঁজার কাজটিকে সাইমন তথ্যমূলক বা intelligence activity বলেছেন। এখানে সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ (intelligence branch) যে ধরনের কাজ করে সাইমন সেই ধরনের কাজের কথা বলেছেন এবং intelligence শব্দটি সেই অর্থে ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়টি হল সম্ভাব্য করণীয় বিষয়গুলো খুঁজে বার করা, তাকে বাড়িয়ে তোলা, আলোচনা করা ইত্যাদি। এটি পরিকল্পনার কাজ। তৃতীয় পর্যায়টি হল বিভিন্ন বিকল্প থেকে একটি নির্দিষ্ট কাজকে চিহ্নিত করা। এটিকে পছন্দসূচক কাজ বলা হয়েছে।

যুক্তিবাদী নীতি-নির্ধারণের কতগুলো পূর্বশর্ত আছে। প্রথমত, বিভিন্ন সামাজিক মূল্যগুলো সম্পর্কে একটা সচেতনতা ও ধারণা থাকা দরকার। দ্বিতীয়ত, বিকল্প কার্য প্রক্রিয়ার সম্পর্কে তথ্য থাকা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, একটি নির্দিষ্ট নীতি-নির্ধারণ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, সেগুলো পর্যালোচনা করা দরকার এবং বিকল্প কর্মসূচীর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার।

মডেলের আর এক বিশেষজ্ঞ ইয়েহ্জ্কেল ড্রর (Yehezkel Dror)-এর মতে এই মডেল সরকারী কাঠামোর সর্বাপেক্ষা অনুকূল (optimal) সংগঠনের কথা বলে যেখানে সঠিক তথ্য, সঠিক তথ্যপ্রেরণ (feedback) এবং বিভিন্ন সামাজিক উপাদানের সঠিক মান পাওয়া যায়। এই ধরনের নীতি-নির্ধারণকে ড্রর "metapolicy" বলেছেন অর্থাৎ নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ার জন্য নীতি-গঠন।[১২]

সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা বা optimality-র বিষয়টি উল্লেখ করে ড্রর যুক্তিবাদী মডেলে নীতি-নির্ধারকদের কাজের ভিত্তি ও পরিসরকে আরও বিস্তৃত করেছেন। যুক্তিবাদী তথ্যের বাইরে নীতি-নির্ধারকদের স্বতঃলব্ধ জ্ঞান ও নেতৃত্বকে প্রয়োগ করার কথাও বলেন ড্রর।

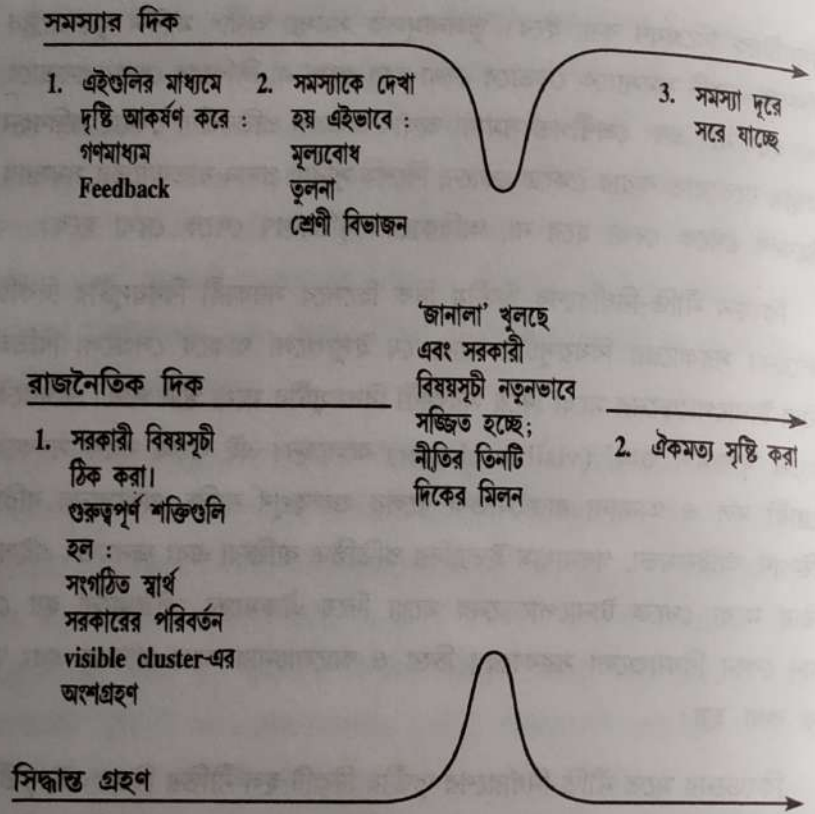

জননীতির রূপায়ণ : উৎপাদ বা প্রভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করতে গিয়ে আগেই বলা হয়েছে যে জননীতি-পর্যালোচনার দ্বিতীয় দিকটি হল জননীতিটিকেই গুরুত্ব দেওয়া। এক্ষেত্রে আলোচনা বর্ণনাত্মক বা মূলবোধ-নিরপেক্ষ থাকে না বরং অনেক বেশী নির্দেশমূলক বা উপদেশমূলক হয়ে ওঠে। এই আলোচনা মূলত কীভাবে নীতিগুলোকে আরও উন্নত করা যায় সেই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করে।

এই ধরনের জননীতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে দুটি মডেল এতদিন প্রচলিত ছিল। যুক্তিবাদী মডেল (rational model) এবং ক্রমবর্ধিত মডেল (incremental

model)। কীভাবে নীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে কাজ করবে তা আলোচনা করে যুক্তিবাদী মডেল। অপরদিকে নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়া বাস্তবে ঠিক কীভাবে কাজ করবে বা কাজ করা উচিত তা ব্যাখ্যা করে ক্রমবর্ধিত মডেল। সাম্প্রতিককালে এই দুই মডেলের মধ্যবর্তী পর্যায়ের একটি মডেল হল 'কৌশলগত পরিকল্পনার মডেল' (Strategic Planning Model)।

যুক্তিবাদী মডেল (The Rationalist Model) : এই মডেল অনুযায়ী একটি নীতিকে তখনই গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিবাদী বলে মনে করা হয় যখন সেটি দক্ষতা দেখাতে পারে বা দক্ষ নীতি হিসেবে স্বীকৃত হয়। দক্ষতা মাপার জন্য একটি নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্ত ধরনের পছন্দ—অর্থাৎ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সব ধরনের উপাদানকে একটি মান দেওয়া হয়। এরপর সম্ভাব্য সব সিদ্ধান্ত বা নীতিগুলোকে চিহ্নিত করা হয় এবং প্রত্যেকটি সম্ভাব্য নীতির পরিণাম (consequence) মাপা হয়। এরপর দেখা হয়, কোন্ নীতিটিকে গ্রহণ করলে সেটি অন্যগুলোর চেয়ে দাম এবং সুবিধার ক্ষেত্রে সবচেয়ে দক্ষ। লক্ষ্যপূরণকে মাথায় রেখে সেই নীতিটিকেই এরপর গ্রহণ করা হয়। এই মডেলের মূল বৈশিষ্ট্য হল সর্বাধিক নীট মূল্যপ্রাপ্তি (maximisation of net value achievement)।

এই মডেলের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হার্বার্ট সাইমন বিষয়টিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেন :

> Rationality is concerned with the selection of preferred behaviour alternatives in terms of some system of values whereby the consequences of behaviour can be evaluated.[১১]

একটি যুক্তিবাদী নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করা উচিত।

(১) যে নীতিটি গ্রহণ করা হবে তার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সমস্ত সামাজিক পছন্দ ও মূল্যকে চিহ্নিত করা এবং তার প্রতিটিকে নির্দিষ্ট মান দেওয়া;

(২) সমস্ত বিকল্প নীতি বা কার্যপ্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করা ও আলোচনা করা;

কিংডনের মডেলটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার আগে কোহেন, মার্চ, ওলসেনের সংগঠিত নৈরাজ্যের তত্ত্বটির কিছু আলোচনা প্রয়োজন। 'A Garbage Can Model of Organizational Choice' নামে একটি প্রবন্ধে Michael Cohen, James March এবং Johan Olsen সংগঠিত নৈরাজ্যের বিষয়টি উপস্থাপিত করেন।[১০] তাঁরা যদিও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে বিষয়টি উত্থাপন করেন, তবে সরকারী প্রশাসনের ক্ষেত্রেও বিষয়টি প্রাসঙ্গিক। যখন একটি সংগঠনে মতানৈক্যের ফলে কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা যায় না, তখন তাকে 'সংগঠিত নৈরাজ্য' বলে।

সংগঠিত নৈরাজ্যের তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, সংগঠনের কোনো সংগঠিত কাঠামো থাকে না; পরিবর্তে কতগুলো চিন্তার সমাবেশ থাকে। সংগঠনের সদস্যেরা সেই কারণে নীতি বা লক্ষ্য সম্পর্কে তাদের পছন্দ সুস্পষ্টভাবে বলতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সামগ্রিকভাবে সংগঠনটি ঠিক কী করে সদস্যেরা তা বলতে পারে না বা জানে না। তৃতীয়ত সিদ্ধান্ত-গ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদের অংশগ্রহণ একেবারেই সুনির্দিষ্ট নয়; কোনো সদস্য কোনো অধিবেশনে যোগদান করবে বা করবে না, তা একেবারেই বলা যায় না।

এই ধরনের সংগঠন কোহেন, মার্চ, ওলসেনের মতে যে সিদ্ধান্ত-গ্রহণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করে তার চারটি দিক আছে : সমস্যা, সমাধান, অংশগ্রহণ এবং পছন্দের সুযোগ। এই চারটির মধ্যে খুব কম সময়েই সমন্বয় ঘটে; কিন্তু যদি ঘটে এবং যখন ঘটে তখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চারটি বিষয়ের সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে কোহেন, মার্চ এবং ওলসেন Garbage Can বা জঞ্জাল ফেলার পাত্র বলেছেন।

জন কিংডন নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনটি দিকের কথা বলেন যেগুলো মোটামুটিভাবে স্বাধীন। প্রথমটি **সমস্যার দিক** যেখানে জনগণ এবং নীতি-নির্ধারকেরা একটি সমস্যার ওপর দৃষ্টিপাত করে, সমস্যাটিকে চিহ্নিত করে নতুন কোনো নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যাটির সমাধান করে বা সমস্যাটি উপেক্ষা করে। নীতি-নির্ধারণের সমস্যা আবার তিন ধরনের হতে পারে : মূল্যবোধের সমস্যা অর্থাৎ রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ থেকে নাকি উদারপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকে

সমস্যাটিকে বিশ্লেষণ করা হবে। তুলনামূলক সমস্যা অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে একটি সমস্যাকে যেভাবে দেখা হবে কঙ্গো বা লিবিয়ার ক্ষেত্রে সেভাবে দেখা হবে না; এবং শ্রেণীগত সমস্যা অর্থাৎ একজন প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যবস্থায় যাতায়াত করার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ সুবিধা প্রদান যাতায়াতের সমস্যার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হবে না, অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হবে।

কিংডন নীতি-নির্ধারণের দ্বিতীয় দিক হিসেবে সরকারী বিষয়সূচীর দিকটি বলেছেন। সরকারের বিষয়সূচীর মধ্যে যে ইস্যুগুলো থাকবে সেগুলো বিভিন্ন শক্তির টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে সরকারী বিষয়সূচীর মধ্যে স্থান পায়। এদেরকে কিংডন 'দৃশ্যমান গুচ্ছ' (visible cluster) বলেছেন। এই গুচ্ছে থাকে সরকার, বিরোধী দল ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, প্রশাসনের বরিষ্ঠ ব্যক্তিগণ, আইনসভা, গণমাধ্যম ইত্যাদির প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা এবং জনমত। এইসব শক্তির মধ্যে থেকে টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছোনো হয় যে কোন্ কোন্ বিষয়গুলো সরকারের চিন্তা ও আলোচনার মধ্যে থাকবে এবং তা ঠিক করা হয়।

কিংডনের মতে নীতি-নির্ধারণের তৃতীয় দিকটি হল নীতির দিক। এই তৃতীয় ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিভিন্ন বিকল্প সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সেটিকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। নীতি-গ্রহণের ক্ষেত্রে যে শক্তিগুলো প্রধান ভূমিকা নেয় তারা কিংডনের মতে রাজনৈতিক শক্তি নয়। এদেরকে কিংডন 'লুক্কায়িত গুচ্ছ' (hidden cluster) বলেছেন। এই গুচ্ছের মধ্যে থাকে জনপ্রশাসক, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরামর্শদাতারা, আইনসভার বরিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা ইত্যাদি। কিংডনের মতে নীতির এই তিনটি দিক অর্থাৎ সমস্যা, সরকারী বিষয়সূচী নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত-গ্রহণ যখন একত্রিত হয় তখনই নতুন নীতি গৃহীত হয়। কিংডন নতুন নীতি গ্রহণের বিষয়টিকে "খোলা জানালার" (open window) সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং মনে করেন যে, সরকারের পরিবর্তন, প্রশাসনিক পরিবর্তন, গণ মাধ্যমে কোনো বিশেষ ইস্যুর প্রচার, বা জনমতের বিশেষ চাপ সরকারী বিষয়সূচীর পরিবর্তন ঘটায় এবং 'জানালা' খুলে যায়, নতুন বাতাস ঢোকে ও নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সরকারের বলপ্রয়োগের লক্ষ্য

		ব্যক্তির আচরণ	ব্যবস্থার আচরণ
সরকারের বলপ্রয়োগের সম্ভাবনা	দূরবর্তী	বণ্টনীয় নীতি বিকেন্দ্রীকৃত আঞ্চলিক আইনসভা-কেন্দ্রিক	গঠনমূলক নীতি কেন্দ্রীকৃত জাতীয় আদর্শমূলক আইনসভা-কেন্দ্রিক
	নিকট	নিয়ন্ত্রণকারী নীতি বিকেন্দ্রীকৃত আঞ্চলিক আমলাতন্ত্র-কেন্দ্রিক বিশেষ স্বার্থ সম্বলিত	পুনর্বণ্টনীয় নীতি কেন্দ্রীকৃত জাতীয় বিশেষ স্বার্থ সম্বলিত আমলাতন্ত্র-কেন্দ্রিক

নয়া-প্রাতিষ্ঠানিক মডেলও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর গুরুত্ব দেয় কিন্তু তত্ত্ব গঠনেও তারা আগ্রহী। কীভাবে নীতি সরকারের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে এবং সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত তা এই মডেলেও আলোচিত হয়। একইভাবে নীতি কীভাবে রাজনৈতিক আচরণ ও ক্ষমতার ক্ষেত্র-র সঙ্গে জড়িত তাও এই মডেল আলোচনা করে।

ব্যবস্থাজ্ঞাপক মডেল : নীতির প্রক্রিয়াগত পর্যালোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ মডেল হল ব্যবস্থাজ্ঞাপক মডেল। এই মডেল জোগান, উৎপাদ, তথ্যপ্রেরণ ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দেয় এবং প্রক্রিয়াকে চলমান, গতিশীল হিসেবে দেখে। এই মডেলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা হলেন ডেভিড ইস্টন। তাঁর The … বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়।[৮]

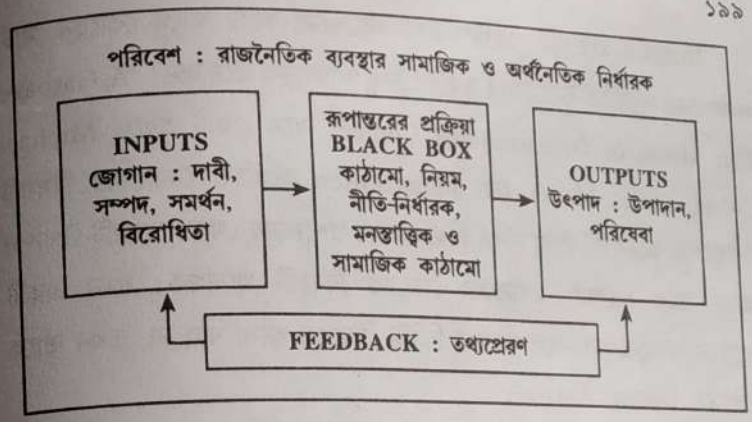

এই মডেল অনুযায়ী রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে একটা স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা হিসেবে দেখা হয় না। অন্যান্য ব্যবস্থা যেমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা—এগুলো সবই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং একে অপরকে প্রভাবিত করে। এই প্রত্যেকটি ব্যবস্থা আবার সামগ্রিক পরিবেশে কাজ করে এবং পরিবেশের দ্বারা নির্ধারিত। রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ইস্টনের মতে মূল্যের কর্তৃত্বপূর্ণ বণ্টন (authoritative allocation of values) করে থাকে। এই কাজটির জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাছে বিভিন্ন ধরনের জোগান বা উৎপাদ আসে। রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার নিজের কাঠামো, নিয়মনীতির মধ্যে দিয়ে জোগানকে উৎপাদে (output) রূপান্তরিত করে। উৎপাদ সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, উৎপাদনের দক্ষতা, কার্যকারিতা রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাছে খবর পাঠায় যা তথ্যপ্রেরণ (Feedback) নামে পরিচিত।

সংগঠিত নৈরাজ্যের মডেল : জননীতির প্রক্রিয়াগত পর্যালোচনার শেষ গুরুত্বপূর্ণ মডেলটি হল সংগঠিত নৈরাজ্যের মডেল। জন কিংডনের (John W. Kingdon) Agendas, Alternatives and Public Policies বইতে এই মডেলটির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।[৯] সংগঠিত নৈরাজ্য সম্পর্কিত একটি তত্ত্ব কোহেন, মার্চ এবং ওলসেন ১৯৭২ সালে গড়ে তোলেন। কিংডন জননীতির পর্যালোচনায় সেই তত্ত্বটিই ব্যবহার করেন। ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে মার্কিন নীতির স্বাস্থ্য ও পরিবহন—এই দুটি ক্ষেত্রে কিংডন প্রায় ২৫০ জনের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে প্রাপ্ত তথ্যে সংগঠিত নৈরাজ্যের তত্ত্ব প্রয়োগ করেন এবং নীতির পর্যালোচনায় এই মডেলটি গড়ে তোলেন।

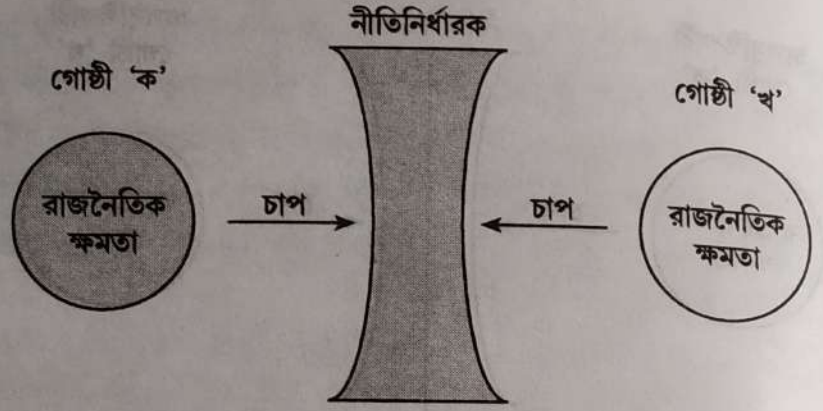

Hydraulic Thesis

প্রাতিষ্ঠানিক মডেল : সনাতনী এই মডেলটি সরকারের সাংগঠনিক কাঠামোর ওপর গুরুত্ব দেয়। বিভিন্ন বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস ও কাজকর্মকে উল্লেখ করে, কিন্তু বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ককে উপেক্ষা করে। সাংবিধানিক ধারা, প্রশাসনিক নির্দেশ, সাধারণ আইন এই মডেলে গুরুত্ব পায় কিন্তু একটি বিভাগ এবং বিভাগ থেকে উদ্ভূত জননীতির মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে তাকে এই গোষ্ঠী আলোচনার মধ্যে রাখে না।

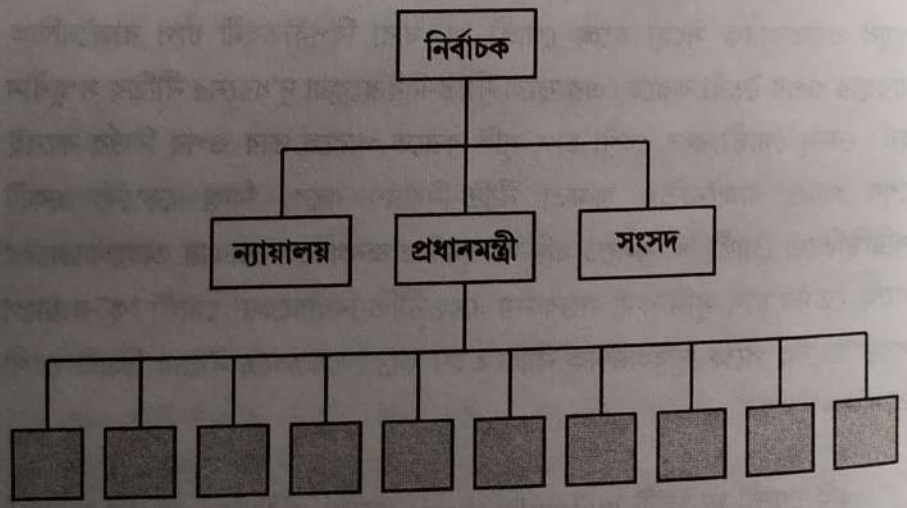

মন্ত্রি-পরিষদ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'আচরণবাদী বিপ্লবে'র পর এই মডেলটি তার জনপ্রিয়তা হারায় এবং গোষ্ঠী মডেল, এলিট-সাধারণ জনগণ মডেল বা ব্যবস্থাজ্ঞাপক মডেল অনেক

বেশী জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে আধুনিক যুগে সরকারের কাঠামোগত যেসব পরিবর্তন হচ্ছে তার প্রেক্ষিতে এই মডেলটির গুরুত্ব বাড়ার সম্ভাবনা আছে। নতুন করে সরকারের বিভিন্ন কাঠামো, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, আমলাতন্ত্রের বিন্যাস ইত্যাদি আলোচনার মাধ্যমে এই মডেলটি আবার প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পেতে পারে। কার্ল ফ্রায়েডরিখের (Carl Friedrich) Constitutional Government and Democracy বইটি এই মডেলটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বই।[৬]

নয়া-প্রাতিষ্ঠানিক মডেল : ধ্রুপদী প্রাতিষ্ঠানিক মডেলের পুনরায় জনপ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও, নীতি-পর্যালোচনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক আর এক ধরনের মডেল গড়ে উঠেছে যেটিকে নয়া-প্রাতিষ্ঠানিক মডেল বলা যায়। থিওডর লোওয়ি (Theodore J. Lowi), র‍্যান্ডাল রিপলে (Randall B. Ripley), গ্রেস ফ্রাঙ্কলিন (Grace Franklin), রবার্ট সলস্‌বেরী (Robert Salisbury), জন হাইনজ্ (John Heinz) প্রমুখেরা নয়া-উদারনীতিবাদের মুখ্য প্রবক্তা।

এঁরা রাজনীতিকে নীতি-নির্ধারক উপব্যবস্থায় ভাগ করার চেষ্টা করেছেন। লোওয়ি নীতিকে ক্ষমতার চারটি ক্ষেত্রে ভাগ করেছেন : পুনর্বণ্টনীয়, বণ্টনীয়, গঠনমূলক এবং নিয়ন্ত্রণকারী। ক্ষমতার ক্ষেত্র ভাগ করার ক্ষেত্রে দুটি বিষয়কে মাথায় রাখা হয়েছে। সরকার তথা রাষ্ট্রকে যদি বলপ্রয়োগের একটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধরে নেওয়া হয় তাহলে বলপ্রয়োগের দুটি দিককে গণ্য করা হয়েছে। সরকারের বলপ্রয়োগের লক্ষ্য (target) এবং বলপ্রয়োগের সম্ভাবনা (probability)। একই সঙ্গে ব্যক্তির আচরণ ও ব্যবস্থার আচরণকেও সম্ভাব্য নির্ধারক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নীতির ক্ষমতাকেন্দ্রিক শ্রেণীবিভাজন, সরকারের বলপ্রয়োগের লক্ষ্য ও সম্ভাবনা এবং ব্যক্তি ও ব্যবস্থার আচরণ—এই বিভিন্ন দিক থেকে নীতির পর্যালোচনা করে লোওয়ি বলেন পুর্নবণ্টনীয় নীতির মধ্যে কেন্দ্রীভবনের সম্ভাবনা বেশী, বণ্টনীয় নীতির মধ্যে বিকেন্দ্রীকরণের মাত্রা থাকে, গঠনমূলক নীতি মূলত আইনবিভাগের মধ্যে থেকে গড়ে ওঠে এবং নিয়ন্ত্রণকারী নীতি স্থানীয় গোষ্ঠীকেন্দ্রিক।[৭]

যায় না, ফলে নির্জীব জনগণকেই নিয়ন্ত্রণ করে 'এলিট' শ্রেণী। এলিট শ্রেণী যে নীতিগুলো গ্রহণ করে তাতে সামগ্রিকভাবে তাদের নিজস্ব নীতির প্রতিফলন ঘটে। যে নীতিগুলো এলিট শ্রেণী গ্রহণ করে তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল স্থিতাবস্থা (status quo) বজায় রাখা। এই মডেলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত C. Wright Mills-এর The Power Elite বইটি।[৩]

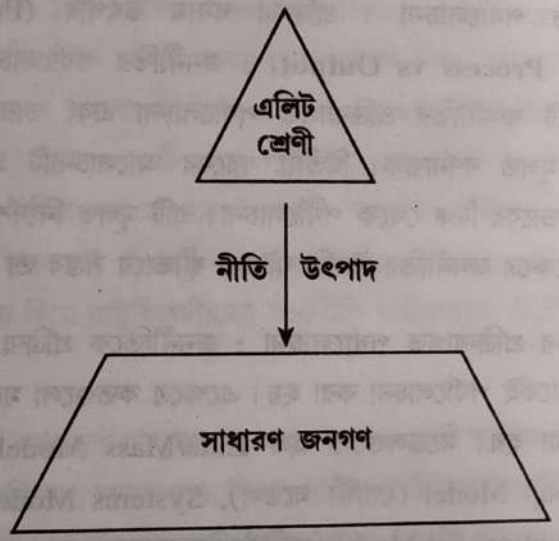

এলিট-সাধারণ মডেল

গোষ্ঠী মডেল (Group Model) : জননীতির প্রক্রিয়াগত মডেলের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য মডেল হল গোষ্ঠী মডেল। আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলো আইনবিভাগের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখে এবং আইনসভার ওপরই চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণার মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' হিসেবে পরিচিত শাসনবিভাগও গোষ্ঠীর প্রভাবের বাইরে যেতে পারেন না। কোহ্লমেয়ার[৪] (L. M. Kohlmeir) তাঁর গবেষণার মধ্যে দিয়ে দেখান যে শাসনবিভাগ গোষ্ঠীর পছন্দমতো নীতি গ্রহণ করে এবং গোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য নীতিকে সমগ্র রাষ্ট্রের উপযোগী বলে চালাতে চায়।

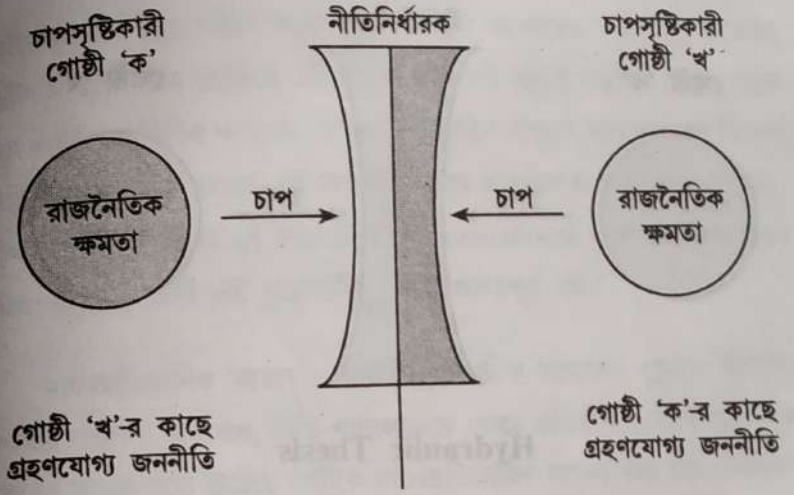

গোষ্ঠী মডেল

এই চিত্রে ধরা যাক যে একটি বিশেষ ধরনের ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা হচ্ছে গোষ্ঠী 'ক' যারা সেই ওষুধের বিক্রি বাড়াবার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতার ওপর ক্রমাগত চাপসৃষ্টি করে চলেছে। অপরদিকে একই অসুখের আর এক ধরনের ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা হচ্ছে গোষ্ঠী 'খ' যারা বিপরীতধর্মী চাপ রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর তৈরী করছে। এর ফলে নীতি-নির্ধারকেরা দু'ধরনের নীতির সম্মুখীন হয়। কোন্ গোষ্ঠী কত বেশী চাপ সৃষ্টি করতে পারছে তার ওপর নির্ভর করেই শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা নীতি-নির্ধারণ করে। কিন্তু কোনো একটি পরিস্থিতিতে গোষ্ঠী 'খ' বলতে যদি অসংগঠিত জনগণকে বোঝায় তাহলে তাদের পক্ষে তেমন চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব নয় এবং নীতি নির্ধারকেরা গোষ্ঠী 'ক'-র চাপে পড়ে তাদের পক্ষে সুবিধাজনক নীতি গ্রহণ করে। সেক্ষেত্রে নীচের চিত্রটি বেশী প্রাসঙ্গিক।

এই গোষ্ঠী মডেলটি hydraulic thesis নামেও পরিচিত। এই তত্ত্ব অনুযায়ী নীতিকে বিভিন্ন ধরনের শক্তির উৎপাদ হিসেবে গণ্য করা হয়। আর্থার বেন্টলের (Arthur F. Bentley) The Process of Government এই তত্ত্বকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে।[৫]

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় জননীতির গুরুত্বকে স্বীকার করা হয় ১৯৬৫ সালে Committee on Governmental and Legal Processes of the Social Science Research Council-এর একটি অধিবেশনে। অধিবেশনে যে প্রশ্নটি আলোচনায় বার বার ঘুরে আসছিল তা হল যে জননীতির বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের বক্তব্য, অভিমত, মূল্যায়ন কী হওয়া উচিত। এই প্রশ্নটিকে ঘিরে কমিটির নিয়ন্ত্রণে ১৯৬৬ এবং ১৯৬৭ সালে আরও দুটি অধিবেশন হয়। একই বছর অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে American Political Science Association-এর বার্ষিক অধিবেশনে একটি স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয় হিসেবে 'জননীতি'কে রাখা হয়। ১৯৮০ সালের মধ্যে Association-এর বিভিন্ন বার্ষিক অধিবেশনে জননীতির ওপর প্রায় ১৫০টি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়, এখন জননীতি পর্যালোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন অধিবেশনেও একটি স্বাভাবিক বিষয়। এছাড়া ১৯৭২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Policy Studies Organization প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের 'জননীতি পর্যালোচনা' যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

'জননীতি পর্যালোচনা' দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি হল জননীতির বিষয়গত পর্যালোচনা। পরিবেশ, জনকল্যাণ, শিক্ষা, নারীদের উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে জননীতির পর্যালোচনা হয়ে থাকে। অন্য দিকটি হল জননীতির তাত্ত্বিক পর্যালোচনা। আলোচকদের মধ্যে এই দিকটি কিছুটা কম জনপ্রিয় হলেও জননীতির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও উপেক্ষিত নয়। নিকোলাস হেনরি[২] (Nicholas Henry) মনে করেন যে জননীতির বিষয়মুখী পর্যালোচনার কিছুটা কার্যকারিতা থাকলেও, এটি রাষ্ট্রকৃত্যকদের বা জননীতি-নির্ধারকদের কোনো নির্দেশ বা কোনো নতুন পথ দেখায় না। সেই কারণে জননীতির তাত্ত্বিক পর্যালোচনার বিশেষ প্রয়োজন।

যেভাবে সাম্প্রতিককালে 'জননীতি পর্যালোচনা' হচ্ছে তাতে তিনটি দিক বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। এগুলো হল :

(১) সুপারিশগুলোর চেয়ে নীতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নীতিগুলো কী নির্দেশ করছে তার চেয়ে নীতিগুলোর ব্যাখ্যা বেশী আলোচিত হচ্ছে;

(২) জননীতির কার্য-কারণ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হচ্ছে; একই জননীতির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াও আলোচনায় স্থান পাচ্ছে;

(৩) নির্দিষ্ট নীতির পর্যালোচনার মাধ্যমে বৃহত্তর জননীতির আলোচনায় পৌঁছোনোর চেষ্টা হচ্ছে এবং এইভাবে জননীতির একটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডার তৈরী করা হচ্ছে।

জননীতি পর্যালোচনা : প্রক্রিয়া বনাম উৎপাদ (Public Policy Analysis : Process vs Output) : জননীতির পর্যালোচনা দুভাবে করা সম্ভব। প্রথমটি জননীতির প্রক্রিয়াগত পর্যালোচনা এবং তার রূপায়ণ। এই আলোচনাটি মূলত বর্ণনাত্মক। দ্বিতীয় ধরনের আলোচনাটি হল জননীতিকে উৎপাদ বা প্রভাবের দিক থেকে পর্যালোচনা। এটি মূলত নির্দেশমূলক বর্ণনাত্মক নয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে জননীতির উন্নতি ঘটানো কীভাবে সম্ভব তা আলোচিত হয়।

জননীতির প্রক্রিয়াগত পর্যালোচনা : জননীতিকে প্রক্রিয়া ও রূপায়ণ—উভয় দিক থেকেই পর্যালোচনা করা হয়। এক্ষেত্রে কতগুলো মডেলের সাহায্যে আলোচনা করা হয়। মডেলগুলো হল Elite/Mass Model (এলিট-জনগণ মডেল), Group Model (গোষ্ঠী মডেল), Systems Model (ব্যবস্থাজ্ঞাপক মডেল), Institutionalist Model (প্রাতিষ্ঠানিক মডেল), Neo-institutionalist Model (নয়া-প্রাতিষ্ঠানিক মডেল) এবং Organised Anarchy Model (সংঘবদ্ধ নৈরাজ্যের মডেল)।

Elite-Mass Model (এলিট-সাধারণ মডেল) : এই মডেল অনুযায়ী ধরে নেওয়া হয় যে সমাজ উল্লম্বভাবে বিভাজিত। একদল রয়েছে যারা রাজনৈতিক ক্ষমতা উপভোগ করে এবং প্রয়োগ করে—এরা এলিট শ্রেণী। অপরদিকে রয়েছে সাধারণ জনগণ বা Mass যাদের কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই। এলিট শ্রেণীর সদস্যদের মূল্যবোধ, চিন্তা-ভাবনা, পছন্দ-অপছন্দ একই ধরনের এবং সেগুলো সাধারণ জনগণের থেকে স্বতন্ত্র। জননীতি উপর থেকে নীচে অর্থাৎ এলিট শ্রেণীর থেকে সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছোয়।

এই মডেল মনে করে যে, সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী কর্তৃত্ব যে পরিবেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেই পরিবেশে সক্রিয়তা অর্থাৎ সঠিক তথ্য পরিবেশন ইত্যাদি দেখা

অষ্টম অধ্যায়

জননীতি

জননীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার আগে 'নীতি' কাকে বলে, সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সাধারণভাবে লক্ষ্য (goal), উদ্দেশ্য (objective), নীতি (policy) এই শব্দগুলো সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু শব্দগুলোর অর্থ ঠিক এক নয়। লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য একটি সংগঠনের বৃহত্তর অভিলাষকে বোঝায় এবং এরই প্রেক্ষিতে নীতি ঠিক করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে ভারত সরকারের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল দারিদ্র্য দূরীকরণ। এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে গ্রামোন্নয়ন, শহরোন্নয়ন, শিল্পোন্নয়নের নীতি গ্রহণ করা হয়।

প্রসঙ্গত, নীতি-নির্ধারণ (policy making) এবং সিদ্ধান্ত-গ্রহণের (decision-making) মধ্যেও একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। জিওফ্রে ভিকার্সের (Geoffrey Vickers)-এর মতে নীতি নির্ধারণের অর্থ কোনো একটি কাজের ক্ষেত্রে দিক নির্ণয় করা, তাকে ঠিক পথে চালিত করা এবং কাজের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। অপরদিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হল নীতিটিকে উপযুক্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে রূপান্তরিত করা।

জননীতির সংজ্ঞা ও তাৎপর্য (Definition and Significance of Public Policy) : একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে একজন ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠী বা একটি প্রতিষ্ঠান বা কোনো সরকার যখন কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে একটি কার্যপ্রক্রিয়া গ্রহণ করে তখন তাকে নীতি বলে। যেকোনো ধরনের সংগঠনই কোনো কাজ করতে যাওয়ার আগে নীতি নির্ধারণ করে। জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সরকারের কাজের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ অনিবার্য একটি কাজ। নীতি-নির্ধারণকে অ্যাপ্‌ল্‌বি (Appleby) জনপ্রশাসনের নির্যাস বলেছেন।

জননীতিকে অন্য ধরনের নীতির থেকে পৃথক বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। সরকারী প্রতিষ্ঠানে, রাষ্ট্রকৃত্যকদের দ্বারা গৃহীত নীতি হল জননীতি।

রাজনৈতিক কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা জননীতি গৃহীত হয়, অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থার "elders, paramount chiefs, executives, legislators, judges, administrators, councillors, monarchs and the like" জননীতি গ্রহণ করে থাকে।

জননীতির কতগুলো তাৎপর্য আছে। অথবা বলা যেতে পারে, জননীতির কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, কতগুলো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে জননীতি গৃহীত হয়। আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জননীতি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। দ্বিতীয়ত, কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর নির্দিষ্ট সময়কালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত হল জননীতি। তৃতীয়ত, সরকার বাস্তবে কী করে এবং তারপর কী ঘটে তা নির্দেশ করে জননীতি; সরকার কী করতে চায় বা কী করার কথা বলে জননীতি তাকে নির্দেশ করে না। চতুর্থত, জননীতির রূপটি ইতিবাচক বা নেতিবাচক হতে পারে। ইতিবাচক দিক থেকে জননীতি যেকোনো বিষয় বা সমস্যার ক্ষেত্রে সরকারী কাজকর্মকে বোঝায়; নেতিবাচক দিক থেকে কোনো বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়াকে বোঝায়। পঞ্চমত, জননীতির ইতিবাচক দিকটি আইনগত দিক থেকে যথেষ্ট সুদৃঢ়; বলা যেতে পারে তার একটা আইনগত ভিত্তি আছে। সেই কারণেই জননীতি মেনে চলতে সমস্ত নাগরিক বাধ্য এবং জননীতির একটা দমনমূলক দিক আছে।

জননীতি আলোচনা—একটি স্বতন্ত্র বিষয় (Public Policy Analysis—A Separate Sub-Field) : জনপ্রশাসন বিষয়টি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের থেকে পৃথক হয়ে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিভিন্ন মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক স্বতন্ত্র বৌদ্ধিক চর্চার বিষয় হিসেবে গড়ে ওঠে। একইভাবে 'জননীতি পর্যালোচনা' (Policy Studies) জনপ্রশাসনের বৌদ্ধিক সীমানার মধ্যে থেকেও একটি স্বতন্ত্র চর্চার বিষয় হিসেবে গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে জননীতি পর্যালোচনার অন্যতম পথিকৃৎ অস্টিন র‍্যানি (Austin Ranney) বলেন : মোটামুটিভাবে ১৯৪৫ সাল থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় লক্ষ্য করা যায় যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা জননীতির প্রক্রিয়াগত দিকটি নিয়ে আলোচনা করছে কিন্তু তার বিষয় নিয়ে তারা তেমন চিন্তিত নয়।[১]

জননীতি পর্যালোচনার এই দুর্বলতাটিই র‍্যানি এবং তাঁর সহকর্মীরা তুলে ধরতে চান। সেই কারণে বলা যায়, প্রথম থেকেই জননীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিকটিকে চিহ্নিত করে। জননীতি পর্যালোচনাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও জনপ্রশাসনের গোধূলিক্ষেত্র বলা যায়।